কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 NOV 2017 ... কলাম ...

মোকামতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

যেন এক বাতিঘর

লিমন বাসার, বগুড়া ▷ কী লিখছে
প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সামিয়া জামান। ক্লাসে বসে খাতায় এক মনে লিখছে। পরিষ্কার খাতায়
দেখতে এগিয়ে যেতেই চোখ ছানাবড়া। এত সুন্দর হাতের লেখা! লিখেছে সে।
কোনো কাটাকুটি নেই। সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতায় বাংলা বিষয়ে বসেছে আইরিন
পাশে দ্বিতীয় শ্রেণির কক্ষে অন্য ছাত্রছাত্রীদের মতোই পাশাপাশি একই রকম।
আক্তার সূচনা ও নুসরাত জাহান সুমনা। দুই বান্ধবীর হাতের লেখা প্রায় ক্লাসের সবারই
আগ্রহ নিয়ে পাশের তৃতীয় শ্রেণির কক্ষে ঢুকেও দেখা গেল একই চিত্র। এককথায়
হাতের লেখা প্রায় একই রকম। গোটা গোটা অক্ষরে এক লাইনে লেখা। জানাল, স্কুল
অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়! সামনের সারির বেঞ্চে বসে থাকা তাসলিমা খাতুন
কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থার কারণে তারা এভাবেই গড়ে উঠেছে।
দেশের অন্যতম মডেল স্কুলের সুনাম পাওয়া বগুড়ার শিবগঞ্জের মোকামতলা সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল এই চিত্র। শিক্ষার্থীতে ভরা প্রথম থেকে পঞ্চম
পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ। খাতায় লেখার বাইরে আর কোনো দিকে মনোযোগ নেই
কারো। ফলে সাড়ে ৮০০ শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতেও বিদ্যালয়জুড়ে যেন পিনপতন
নীরবতা। ছুটির দিনগুলোতেও এ ধরনের বিশেষ ক্লাস বা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু
রয়েছে এই স্কুলে।
শিক্ষকরা জানান, পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী কিংবা অন্য শ্রেণির বার্ষিক
পরীক্ষার আগে তো বটেই, ওই সব পরীক্ষা চলার মাঝখানেও যখন দু-এক দিনের
বিরতি থাকে, তখনো এ ধরনের বিশেষ ক্লাস বা পরীক্ষা নেন শিক্ষকরা। সকাল ৮টা

▶▶ বিশেষ পৃষ্ঠা ৩ ক. ৫

যেন এক বাতিঘর

▶▶ বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে শুরু হয়ে চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। দুপুরে এক ঘণ্টা খাওয়ার বিরতি।

জানা যায়, বিদ্যালয়টিকে বদলে দেওয়ার স্বপ্নগুরু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান। তিনি সঙ্গী হিসেবে পান সিনিয়র শিক্ষক রেজাউল ইসলাম দুলালকে। মূলত এই দুজনের কারণে ২০০৬ সালের পর থেকেই বদলে যেতে থাকে স্কুলের রূপ। প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান জানান, এখন শিক্ষার্থীর চাপ সামলাতে প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি করে শাখা খুলতে হয়েছে। আর শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রামের এই বিদ্যালয়েও ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হয়েছে। এর পরও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছেই।

মোকামতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মনোয়ারা বেগম জানান, ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বগুড়া-রংপুর মহাসড়কসংলগ্ন এই বিদ্যালয়ের আশপাশে একাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে ওঠায় ২০০৪ সালের পর থেকে তাঁদের শিক্ষার্থী কমতে শুরু করে। পরের কয়েক বছর এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে গড়ে ৩০ জন ছাত্রও পাওয়া যায় না। বিষয়টি তাঁদের ভাবিয়ে তোলে। ২০০৮ সালে বিদ্যালয়টিতে রেজাউল ইসলাম দুলাল নামের একজন শিক্ষক যোগদান করার পর তিনি শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা সুন্দর করার কাজে মনোযোগী হন। তিনি শুরুতেই প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বেছে নেন এবং তাদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষার হরফগুলো সুন্দর করে লেখার কৌশল হাতে-কলমে শেখানো শুরু করেন। এক বছরের মধ্যে কিছুটা সাড়া পড়ে। আর এর আগেই যোগদান করা প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান হাতের লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠদান পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। সহকর্মী সব শিক্ষক নিয়ে সভা করে তিনি প্রতিদিন বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ক্লাস শুরু হওয়ার দুই ঘণ্টা আগে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মেধা উন্নয়ন ক্লাস করানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে জন্য শিক্ষার্থীদের সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়। পড়ালেখার পাশাপাশি নাচ-গান ও খেলাধুলার ব্যাপারেও তাদের উৎসাহী করে তোলা হয়। বিদ্যালয় ছুটির পর সন্ধ্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত পড়ালেখা করছে কি না সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেন।

এ ধরনের পর্যবেক্ষণব্যবস্থার কারণে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার প্রতি খুবই যত্নবান। ২০০৮ সালের পর থেকে শতবর্ষী ওই বিদ্যালয়ের সার্বিক ফলেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ২০১০ সালে বিদ্যালয়টি সারা দেশে মেধাতালিকায় নবম স্থান অর্জন করে। ২০১৫ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ৯০ শিক্ষার্থীর সবাই জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বৃত্তি পেয়েছে ২৭ শিক্ষার্থী। এ কারণে সারা দেশে মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। সুন্দর হাতের লেখার জন্য জেলার সেরা এই স্কুলে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাফল্যও সবার মন কেড়ে নিয়েছে।

প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান বলেন, '২০০৬ সালে এই স্কুলে যোগ দিই। এসেই স্কুলে হতাশাজনক পরিবেশ দেখতে পাই। এরপর ধীরে ধীরে স্কুলটি বদলে দেওয়ার শপথ নিই। ২০০৭ সাল থেকেই মূলত বিদ্যালয়টি বদলে যেতে থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের পাঁচটি ক্লাসে ৮০০ জন শিক্ষার্থী ও ১৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিশেষ করে শিক্ষকদের আন্তরিকতার কারণেই বিদ্যালয়ের এই বদলে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।' প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের চারদিকে লেখা কিছু স্লোগান দেখিয়ে জানান, এসব স্লোগান মেনে চলে শিক্ষার্থীরা।